মূলপাতা

লাইফস্টাইল উপাসনা

SEAN Publication

March 26, 2021

7 MIN READ

২০০৭ সালের কথা। তখন আমি যে প্রতিষ্ঠানটিতে কাজ করতাম সেটিতে আমার চাকুরির বয়স প্রায় চার বছর। ম্যানেজমেন্ট কিছুদিন ধরে আমার সাথে কিছুটা বিমাতাসূলভ আচরণ করছে। কারণ খুঁজতে লাগলাম। দেখলাম—এর কারণ হলো, প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ওপর আমার প্রভাব। তাদের ওপর আমার প্রভাব না-কি ম্যানেজমেন্টের চেয়ে অধিক। কর্মীরা যে-কোনো বিষয়ে আমার কথা শুনতে আগ্রহী। যে-কোনো সমস্যা সমাধানে আমার কাছে আসে। মূলত এর কারণ ছিল—আমি তাদের সুবিধা-অসুবিধা ও অধিকার নিয়ে কথা বলতাম।

প্রতিষ্ঠানটি নানা রকম অপব্যয়মূলক কার্যক্রমে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে কৃপণতা না করলেও কর্মীদের বেতনভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে ছিল একেবারেই উদাসীন। কিছুদিন পরপর সোনারগাও শেরাটনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে প্রোগ্রাম করে, অথচ বছর শেষে কর্মীদের কোনো বেতন বাড়ে না। ৫০০ টাকা বেতন বাড়াতে হলেও দেন-দরবার করতে হয়। এমন কর্মীও দেখেছি যার তিন-চার বছরের মধ্যেও এক টাকা বেতন বাড়েনি। এ সকল ব্যাপারে আমি দায়িত্ব ও ঝুঁকি নিয়ে কথা বলার কারণে ম্যানেজমেন্ট আমার প্রতি নাখোশ।

সেদিন ছিল সম্ভবত মাসের শেষ দিন। অফিস শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে ডিজি সাহেব আমাকে তার রুমে ডাকলেন। তার রুমে কাজের প্রয়োজনে আমাকে প্রায়ই যেতে হতো। তাই আমি স্বাভাবিকভাবেই গেলাম। কিন্তু তিনি আমাকে চমকে দিয়ে বললেন, ‘আপনি আমাদের সাথে এখন থেকে চুক্তিভিত্তিক কাজ করেন, এতে আপনি বেতনের চেয়ে অনেক বেশি উপার্জন করতে পারবেন, আবার ৯-৬ টা অফিসের বাধ্যবাধকতাও থাকবে না।’

আমি মিনিটখানেক চিন্তা করলাম এবং এ কথার ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরিটা বুঝতে চেষ্টা করলাম। তারা আমাকে সরাসরি ফায়ার করার চিন্তা করতে পারেনি; কারণ, প্রতিষ্ঠানে আমার কন্ট্রিবিউশনটা খুব ভাইটাল; এটাকে তারা হারাতে চাচ্ছে না। আবার একইসাথে আমাকে অফিসের নিয়মিত কর্মী হিসেবে রেখে আমার উত্থাপিত নানা বিষয়ের সামনেও পড়তে চাচ্ছে না আর।

আমি এক মিনিট পর ডিজি স্যারের চোখে চোখ রেখে বললাম, ‘স্যার, আমাদের কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী আমাকে টার্মিনেট করতে কিংবা আমার পক্ষ থেকে জব ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তিন মাসের একটা আগাম নোটিশের শর্তআছে; আপনি আজ থেকে তিন মাস গণনা শুরু করবেন।’

আমার আচমকা এমন কথায় স্যার হকচকিয়ে গেলেও সামলে নিলেন। এমন একটা ভাব করলেন যে তিনি আসলে এটা বলতে চাননি। একইসাথে আমি এমন একটা আত্মমর্যাদাপুর্ণ অবস্থান নিয়ে নেবো সেটাও ভাবতে পারেননি; কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বলতে লাগলেন, ‘আরে ওই প্রজেক্টের কাজের কী হবে, এইটা কিন্তু তোমাকে আমার চুক্তিভিত্তিক হলেও করে দিতে হবে... ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বেশ ঠান্ডা মাথায় বললাম, ‘স্যার চুক্তিভিত্তিক কাজের ব্যাপারটা নিয়ে তিন মাস পর কথা হবে, তখন আপনিও আমার বস থাকবেন না, আমিও আপনার এমপ্লয়ি না; আপনি চাইলে কাজ দেবেন, আমি চাইলে করব ইন-শা-আল্লাহ।’
কথা শেষ করে সালাম দিয়ে যথেষ্ট ভদ্রতার সাথে আস্তে করে রুম থেকে আসি এবং একেবারে শেষ সময়ে বিদায় নেবার আগ পর্যন্ত সহকর্মীদের কাউকে বুঝতে দিইনি যে, আমি শীঘ্রই কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। মজার ব্যাপার হলো, যে-কোনো কারণেই হোক, ডিজি সাহেবও কাউকে ব্যাপারটি বলেননি বা বলতে পারেননি।

অনেকের মনে হতে পারে, নিশ্চয়ই আমি বেশ ধনবান পরিবারের সন্তান, শখের বসে চাকুরি করতাম; তাই কেয়ার করিনি। কিন্তু না। আমি যথেষ্ঠ অস্বচ্ছল পরিবারের সন্তান, তবে অন্যের কাছে হাত পাততে হতো না, আলহামদু লিল্লাহ। ঠিক এই ঘটনার

কিছুদিন আগে আমার বাবা যে সামান্য চাকুরিটা করতেন সেটারও মেয়াদ শেষ করে তিনি অবসরে আসেন। সংসারের বড় সন্তান হিসেবে গোটা সংসারের দায়ভার তখন আমার একার কাঁধে। আমার এই চাকুরিটা ছাড়া এক পয়সা ইনকামের আর কোনো রাস্তা ছিল না। বৌ-বাচ্চা নিয়ে এই উপার্জন দিয়েই কোনোমতে ঢাকা শহরে বসবাস করতাম; আবার মাস শেষে যথাসম্ভব বাড়িতে খরচের টাকা পাঠাতাম।

চাকুরি ছেড়ে দেওয়ার আগেই বাসা ছেড়ে দিলাম। তিন-চার বছর ঢাকাতে রাখার পর স্ত্রী-কন্যাকে আবার গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে মেসে উঠে গেলাম। চুক্তিভিত্তিক একটা প্রজেক্ট নিয়েছিলাম সেই প্রতিষ্ঠানেরই, কিছুদিন সামাল দেওয়ার জন্য। আলহামদু লিল্লাহ, সেটা তিন-চার মাসের পরিশ্রমে প্রায় এক বছরের ইনকাম চলে এসেছিল। প্ল্যান ছিল যতদিন নতুন কিছু না করে উঠতে পারি এই অর্থ দিয়ে সামাল দিয়ে চলব।

পরিবার-সহ একবার দাম্পত্য জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার পর ব্যাচেলর থাকার কষ্টটা কেবল সে-ই বুঝবে যে এটার মধ্য দিয়ে গেছে। সেভাবেই আছি, চুক্তিভিত্তিক প্রজেক্টের কাজ করি আর নানা দিকে ট্রাই করি। এ সময় আমার বিলেতি এক বন্ধুকেও জানিয়েছিলাম ব্যাপারটি।

দু'মাসের মাথায় সেই বন্ধু মারফত বিলেত থেকে একটি চ্যারিটি অর্গানাইজেশন থেকে একটি চাকুরির প্রস্তাব পেলাম। ঢাকাতে থেকেই তাদের কাজ করতে হবে। বেতন আগের প্রতিষ্ঠানের চেয়ে প্রায় চারগুণ।

আগের বাসার চেয়ে অনেক বড় ফ্ল্যাট বাসা ভাড়া করে আবার ফ্যামিলি নিয়ে এলাম মাত্র তিন মাসের মাথায় এবং জীবনধারা আগের চেয়ে বস্তুগত দিক থেকে বেশ উন্নতই হলো বলা যায়।

আজ এক যুগেরও বেশি সময় পর যখন এই গল্পটা আমি লিখছি এটা আমাকে অসম্ভব একটা ভালো অনুভূতি দিচ্ছে। নিজের প্রতি আস্থার অনুভূতি দিচ্ছে। আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলছে। আত্মসম্মানের ব্যাপারটাকে মনের আরো গভীরে প্রোথিত করছে। সর্বোপরি একটা পবিত্র ভালো লাগা গোটা হৃদয়-মনজুড়ে কেমন অনুরণিত হচ্ছে। আশা করি এই আত্মসম্মানবোধ আগামী দিনে সামনে এগিয়ে যেতে আমার অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করে যাবে—যতদিন বেঁচে আছি ইন-শা-আল্লাহ।

গল্পটা কেন বললাম? কিছুদিন আগে ফাহাম আব্দুস সালাম তার একটা ভিডিও বক্তব্যে এমন একটা কথা বলেছিলেন যে, 'শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে মা'বুদ হচ্ছে তাদের লাইফস্টাইল; তারা লাইফস্টাইল রক্ষার স্বার্থে হেন নিকৃষ্ট কাজ নেই যা করতে পারে না।' হুবহু কোট করছি না, বক্তব্যটা এমনই ছিল।

আমাদের ব্যক্তিজীবন থেকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যত রকম অপমান, অপদস্থতা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা রয়েছে এর অন্যতম একটা কারণ হলো—লাইফস্টাইলের পূজা।

পৃথিবির সকল স্বৈরাচার, সকল মাফিয়া গ্যাং লিডার, সকল অনাচারী এস্টাবলিশমেন্ট টিকে থাকে একদল লাইফস্টাইল পূজারীর সহযোগিতায়। অর্থের বিনিময়ে হেন নিকৃষ্ট কাজ নেই যা তারা করে না; আর তা জায়েজ করার করার জন্য দাত কেলিয়ে বলবে, "আমরা তো চাকুরি করি, আমাদেরকে উপরের নির্দেশ পালন করতে হয়"। যে ব্যক্তি বেতন তথা অর্থ পাওয়ার কারণে জেনেশুনে অন্যায় নির্দেশ পালনে সম্মত হয়, সে যতই শিক্ষিত আর স্যুটেড-বুটেড ভদ্দর লোক সাজুক না কেন, সে মানুষের কায়ায় অমানুষ, সে এই সমাজের সবচেয়ে অসভ্য আর ইতর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এই নিকৃষ্ট মানবকিটগুলো যদি না থাকত কোনো স্বৈরাচার কিংবা মাফিয়া তার এস্টাবলিশমেন্ট টিকিয়ে রাখতে পারত না।

মানুষ যখন একটা নির্দিষ্ট লাইফস্টাইলের পূজা করতে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং সেটা ছাড়া তার জীবন কল্পনা করতেও পারে না, তখন তার সামনে সেই লাইফস্টাইলের মুলো ঝুলিয়ে তাকে দিয়ে যে-কোনো অন্যায় করিয়ে নেওয়া যায়। লাইফস্টাইল হারানোর হুমকি দিয়ে যে-কোনো রকম অপমান করতে পারবেন—সে মেনে নেবে। লাইফস্টাইল রক্ষা নিশ্চয়তা দিয়ে যে-কোনো লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিতে পারবেন—সে তা সয়ে যাবে। সে কেবল তার লাইফস্টাইল রক্ষার জন্য সবকিছু মেনে নেবে। এদের লাইফস্টাইল

হয়তো রক্ষা হয়, কিন্তু আমি নিশ্চিত এরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চোখে চোখ রেখে নিজেকে বলতে পারবে না 'আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত।'

একজন মানুষ যদি আত্মসম্মান নিয়ে না বাঁচে, আত্মমর্যাদার সুরক্ষায় বুক চেতিয়ে না দাঁড়াতে পারে, তবে সে তার সন্তানদেরকে কীভাবে বলবে, 'বুকে সাহস রেখে চলবে, ন্যায়ের পথে থাকবে!'

মহান আল্লাহ, সপ্ত আকাশ ও যমিনের মালিক, গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্যের মালিক, মহান আরশের অধিপতি বলেছেন, 'ওয়ালাক্বাদ কাররামনা বানী আদাম—আমি আদম-সন্তানকে সম্মানিত করে বানিয়েছি।' মহান আল্লাহ বলেছেন, 'খলাক্বনা লাকুম মা ফিল আরদি জামি'আ—আসমান-যমিনে যা-কিছু আছে আমি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি।' সেই আদম সন্তান যদি নিজের রুটি-রুজি আর বিলাসিতার সুরক্ষার জন্য আত্মমর্যাদা বিকিয়ে দেয় তবে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য; পৃথিবীতে দুষ্টু লোকদের রাজত্ব কায়েম হওয়া অনিবার্য!

১৯৭৩ সনের আন্তর্জাতিক বাজারে তেল সংকটের কথা আপনাদের জানা থাকতে পারে। সে বছর অক্টোবরের দিকে সৌদি শাসক কিং ফয়সাল পশ্চিমাদের কাছে তেল বিক্রি বন্ধের ঘোষণা দেন। আমেরিকান ফরেইন মিনিস্টার হেনরি কিসিঞ্জার এসেছিলেন কিং ফয়সালের সাথে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি সমাধান করতে। কিসিঞ্জার বলেছিলেন, 'সৌদি এরাবিয়া যদি বয়কট না তোলে তাহলে আমেরিকা বোম্বিং করে সৌদি গ্যাসক্ষেত্রগুলোকে ধ্বংস করে দেবে।' কিং ফয়সাল বলেছিলেন, 'তোমরা হলে এমন জাতি যারা তেল ছাড়া একদিনও চলতে পারবে না; আমরা মরুভূমি থেকে এসেছি, প্রয়োজনে আবার মরুভূমিতে ফিরে যাব। আমাদের পূর্বপুরুষরা উটের দুধ আর খেজুর খেয়ে জীবন ধারণ করতেন, আমরাও দরকার হলে আবার সেই জীবনে ফিরে যাব।'

হেনরি কিসিঞ্জার একপর্যায়ে বলেন, 'মহান বাদশা! আমার প্লেনের তেল ফুরিয়ে গেছে; প্লেনের তেলটা ভরে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, আমরা আন্তর্জাতিক দর অনুযায়ী এর মূল্য পরিশোধ করব।' কিং ফাহাদ মাথা তোলেননি। অত্যন্ত শীতল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'আমি একজন বৃদ্ধ মানুষ, আমার ইচ্ছা আমি মাসজিদুল আকসায় সালাত আদায় করব, আমেরিকা কি আমার ইচ্ছা পূরণে আমাকে সহযোগিতা করতে প্রসস্তুত?'

এটা হলো আত্মসম্মান, এটা হলো আত্মমর্যাদা। অহংকার পরিহার করুন, আত্মমর্যাদাবান হোন। কাউকে সুযোগ দিবেন না আপনাকে অপমান করতে। প্রয়োজনে দারিদ্রকে গ্রহণ করে নিন, অপমানের মধ্যে বসবাস করবেন না। অপমান সহ্য করে নেওয়া আপনার আত্মসম্মানকে ধ্বংস করে দেবে। আত্মসম্মানহীন মানুষ শেষ পর্যন্ত নিজের ঈমান ধরে রাখতে পারে না। হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কুফুরির পথে পা বাড়ায়।